গণশক্তি আমরা নিরপেক্ষ নই, মেহনতী মানুষের পক্ষে

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে সংহতির স্পর্ধিত আহ্বান

মহামারীতে সবচেয়ে বিপন্ন প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ

কান্তি গাঙ্গুলি

আনন্দমঠ উপন্যাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ‘‘এই দুর্বৎসর কালের করাল গ্রাসে পতিত হইল’’। আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর আগের এক মানবিক বিপর্যয়ের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে এক কালজয়ী বাঙালি সাহিত্যিক যে কথা লিখেছেন, ২০২০ সালটার দিকে নজর দিলে আমাদেরও অনেকটা সেরকম মনে হতে পারে। করোনা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী বিস্তার ও তার ফলে সৃষ্ট অতিমারীর কারণে গোটা পৃথিবীর অর্থনৈতিক তথা সামাজিক বাস্তবতায় যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতিমারীর প্রাথমিক অভিঘাতে যখন দিশাহীন পৃথিবীর তামাম উন্নত দেশ, তখন যে কথাটি নীতিনির্ধারকদের একাংশকে অনেকটা তোতাপাখির মতো বলতে শোনা গিয়েছিল, তা হলো এই যে, ভাইরাস কোনও ভেদাভেদ করে না। কিন্তু, ধীরে ধীরে যখন চিত্রটা স্পষ্ট হতে শুরু করল, তখন বোঝা গেল যে, ভাইরাসের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম। শুধু তাই নয়, এই ভাইরাসকে মোকাবিলা করার জন্য বিশেষজ্ঞরা যে নিদান দিয়েছেন তাও সমাজের বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এ বছরের স্লোগান বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে। ‘‘সব প্রতিবন্ধকতা দৃশ্যমান নয়’’ – এই স্লোগানকে সামনে রেখেই এই দিনটা গোটা পৃথিবী জুড়ে পালিত হবে এই বছর। থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, সিকল সেল, অ্যানিমিয়া, লার্নিং ডিসেবিলিটি ইত্যাদি বিষয়গুলি সমাজে সে অর্থে দৃশ্যমান নয়, এমন ধরনের প্রতিবন্ধকতা। নতুন প্রতিবন্ধী অধিকার আইনে উপরোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০১৬ সালে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশের প্রতিবন্ধী জনগণ অর্জন করেছেন প্রতিবন্ধী অধিকার আইন-২০১৬। যদিও এই আইনের ইতিবাচক প্রস্তাবগুলির নব্বই শতাংশই কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য-কেন্দ্র কোনও হলে প্রতিবন্ধকতার অনেক ধরণের নিউরো জেনিটিক্যাল সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব, কিন্তু বাজারের মূল্যে তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অতিমারী ও এই দেশের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ

গত ২৪ মার্চ মাত্র ৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তিতে গোটা দেশকে স্তব্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রের সরকার। এর ফলে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশের স্বাভাবিক জনজীবন। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না বলেই অনেক বিশেষজ্ঞ তখন মনে করেছিলেন, আজও অনেকে তাই মনে করেন। কিন্তু, যে কথাটা প্রশ্নাতীতভাবে বলা যায় তা হলো এই যে, লকডাউন ঘোষণার আগে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ওপর এর কী প্রভাব গড়তে পারে সেই দিকটি সম্যকভাবে অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যথেষ্ট গাফিলতি ছিল। এর ফলে সমাজের যে অংশের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল তা হলো প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, বিশেষত সেই সব মানুষ, পরিভাষায় যাদের বলে “with high support need”। অর্থাৎ, জীবনধারণের জন্য যাদের তুলনামূলকভাবে বেশি সহায়তার প্রয়োজন। অনেককেই নির্ভর করতে হয় আংশিক বা সর্বক্ষণের পরিচর্যাকারীর (care-giver) ওপর। যাদের অতিমাত্রায় সহায়তার প্রয়োজন নেই, আকস্মিক লকডাউনের ফলে বিপন্নতা নেমে এসেছিল তাঁদের জীবনেও। বহু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনার জন্য স্কুল, কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকেন। স্বল্পদিনের ঘোষণায় ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে এই অংশের ছাত্রছাত্রীরা তীব্র অনিশ্চয়তা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনুলেখকের সাহায্যে পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাঁদের বিপন্নতা সহজেই অনুমেয়, কারণ, সংক্রমণের আশঙ্কায় অধিকাংশ মানুষই তাদের সহায়তা করতে অগ্রসর হননি। বহু ছোট বা মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বন্ধ হয়ে গেছে, কর্মীসঙ্কোচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ছোট থেকে বড়, বহু শিল্পসংস্থাই। এর ফলে প্রথমেই যে সমস্ত কর্মীর ওপর নেমে এসেছে ছাঁটাইয়ের খাঁড়া, তাঁরা হলেন এসপিএইচএইচ কার্ড, যেখানে পর্যাপ্ত মাত্রায় খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না। এরা সকলেই বিপিএল, কিন্তু যারা বিপিএল নন তাদের কি হবে?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই বিপিএল তালিকায় স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্পে যুক্ত করতে হবে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যায় যদিও খুবই স্বল্প, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর তারা এই প্রকল্পে নিজেরাই যুক্ত হবেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের আত্মমর্যাদা আছে এবং তারা ভিক্ষুক নন। সরকারি ব্যবস্থাটাই আসলে এমন! এখানে মানবাধিকার কমিশন, নারী কমিশন, সংখ্যালঘু কমিশন–কোথাও প্রতিবন্ধীদের ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য আলাদা কোনও সুগম্য সরল বিভাগ খোলার কথা ভাবা হয়নি। আমাদের সরকারি নীতিতেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো উপকরণ প্রায় নেই বললেই চলে। সে কারণেই বেসরকারি স্কুল এবং কিছু সরকারি স্কুলে অনলাইন এডুকেশন চালু হলেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৯৫ শতাংশ বিশেষ বিদ্যালয়ে অনলাইন এডুকেশনের কোনও ব্যবস্থাই নেই। এই সমস্ত স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি হচ্ছেন এসডিও, কিন্তু তাঁর অনেক কাজ। অথচ নাইন-টেন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের বিশেষ ক্লাস বিশেষভাবে নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি সকলেই ভাবছেন– এই তো বেশ আছি, ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি? এই হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তথাকথিত শিক্ষা। আমাদের রাজ্যে বিশেষ বিদ্যালয়গুলো এককথায় ধুঁকছে। নতুন করে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, হস্টেলের কুক, হস্টেল সুপার গত ১০ বছর নিয়োগই প্রায় হয়নি। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে তা হাতে গোনা। আসলে প্রশ্নটি নীতি নির্ধারণের। আমাদের দেশে সংসদে, ন্যায়ালয়ে, রাজনৈতিক কাঠামোয়, আমলাতন্ত্রে– কোথাও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তেমন কোনও অংশগ্রহণ নেই। প্রায় ৮-১০ শতাংশ মানুষ যেন মানুষের সংজ্ঞা থেকে উধাও হয়ে গেছে। আর সেজন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের আরোগ্য সেতু অ্যাপে কোনো টকি বা সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সফটওয়্যার সংযুক্ত করা হয়নি, যাতে তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অ্যাকসেসেবল বা সুগম্য হয় এবং এজন্য বলার কেউ নেই। অন্যদিকে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা কিভাবে সরকারি পরিবহণে

অতিমারীর সংক্রমণ ও দীর্ঘ লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে যে বিপুল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে মনোরোগ। অনেক উন্নত দেশের বিশেষজ্ঞরাই বলছেন যে, করোনা অতিমারীর প্রকোপ কমলেও বিভিন্ন মানসিক রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশেও এই একই প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন। আমাদের দেশের মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব এবং চিকিৎসক-সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতা এই সঙ্কটকে তীব্রতর করবে বলেই আমাদের আশঙ্কা। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি এই যে, মেন্টাল হেলথ কেয়ার আইনের ধারাগুলিকে দ্রুত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

লকডাউনের পর্যায়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের চূড়ান্ত অপ্রতুলতা। এর ফলে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন বহু রোগী, বিশেষ করে সেই সব মানুষ যাঁরা থ্যালাসেমিয়ার মতো রোগে আক্রান্ত। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই রোগীদের সুস্থ থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো রক্তের জোগান। ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের সঙ্কট তাই তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

অন্যদিকে নয়া উদার অর্থনীতির প্রবক্তরা যখন অর্থনীতির নীতি নির্ধারণে সরকারের ভূমিকাকে একেবারেই অস্বীকার করতে চান, তখন উলটোদিকে করোনা অতিমারীর পরিবর্তী বিশ্বে দেখা যাচ্ছে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেখানে এবং যে দেশে নেই, সেই দেশগুলিই করোনা অতিমারীতে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সে কারণেই বিশ্বজুড়ে নতুন করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগের দাবি উঠেছে। প্রতিবন্ধকতার মেডিক্যাল ও সোশ্যাল মডেল, দুটি প্রেক্ষিতেই এই প্রশ্নটি জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকাবের সমাজকল্যাণ মন্ত্রক সেই কারণে মেন্টাল হেলথ বিষয়ে একটি হেল্প লাইন চালু করেছে– প্রাপ্তি এইটুকুই। অন্যদিকে রাজ্যের প্রতিবন্ধী কমিশনারের দপ্তর থেকে সেটাও সঠিকভাবে প্রতিবন্ধী সংগঠনগুলিকে জানানো হয়নি। কারণ রাজ্য প্রতিবন্ধী কমিশনারের অফিসটিও এই প্যানডেমিক সময়ে একেবারে কার্যকরী নেই। অন্যদিকে ন্যাশনাল ট্রাস্ট তুলে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা এবং সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও

সরকারেরই সদর্থক কোনও পদক্ষেপ নেই। কারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা এক ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এক্ষেত্রে বলছে, 'ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট মাইনোরিটি কমিউনিটি' এবং সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পনেরো শতাংশ ব্যক্তি কোনও না কোনোভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী আমাদের দেশে ২৭ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যা এই তথ্যকে মান্যতা না দিয়ে ২০১৩ সালের সার্ভে মোতাবেক দাবি করেছে সংখ্যাটা প্রায় ৬৩ মিলিয়ন। তবু দেশের রাজনীতিতে এই ৬৩ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার পরিজনসহ ১০ কোটির ওপর জনসংখ্যাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয় না। ইনক্লুসিভ এডুকেশন, শিক্ষার অধিকার আইন, প্রতিবন্ধী অধিকার আইন অথবা সুগম্য ভারত অভিযান প্রকল্পের মতো যোজনা খাতায় কলমেই থেকে যায়। ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী আইনে একুশটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। থ্যালাসিমিয়া, হিমোফিলিয়া, অ্যাসিড আক্রান্ত ইত্যাদি নতুন বিভাগ যুক্ত হয়েছে। তাই মনে করা হয় ২০২১ সালের জনগণনায় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যাটা প্রায় ১০০ মিলিয়নের কাছাকাছি দাঁড়াবে।

প্রকৃতিকে যেভাবে আমরা লুট করছি, তাতে আগামীদিনে আরও বেশি করে ওজনস্তরে ছিদ্র দেখা দেবে, কোটি কোটি টন কার্বন নিঃস্বরণ হবে, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র ধ্বংস হবে। একইভাবে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেবে। নিত্যনতুন কোভিড সহ সার্স ভাইরাস, নিপা ভাইরাস, ইবোলা ভাইরাসজনিত মহামারীতে এই নীলগ্রহ আক্রান্ত হবে। কিন্তু গরিব দেশের গরিব মানুষ যেসব ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, যেমন – ইবোলা (পশ্চিম আফ্রিকা), যক্ষ্মার ব্যাকটিরিয়া (ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশ), এই সমস্ত রোগ নিরাময় নিয়ে গবেষণা করে না বহুজাতিক বিগফার্মা কোম্পানিগুলি। বরং তারা চাইবে এই রোগ যাতে পুরোপুরি না সারে এবং ওষুধের ব্যবসার দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা তৈরি হয়। বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ বহুজাতিক লগ্নিপুঁজির হাতের পুতুল। প্রতিবন্ধকতার বিষয়টিও সামগ্রিক বিচারে অনেকটাই এই ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। ঠিকমতো সঠিকপথে গবেষণা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, কারণ এখনও সমাজের চোখে এই অংশের মানুষ ততটা উৎপাদনক্ষম নয়। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মহীনতার কথা উল্লেখ করতে হলে আর যে অংশের কথা বলতেই হবে তাঁরা হলেন সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা প্রতিদিন ট্রেনে বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ট্রেন বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁদের জীবনে যে বিপুল সঙ্কট নেমে এসেছে।

২০২০ সালের ২৬ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন দপ্তর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, সেই নির্দেশিকা রূপায়ণ পর্যন্ত করেনি এই রাজ্যের সরকার। এই বঞ্চনার ছবি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে আমফান ঘূর্ণিঝড় এই রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়ার পর। সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে ২০১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে যে আইন পাশ হয়েছিল দেশের সংসদে, সেই আইনের ২৪ ধারায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং অন্যান্য সামাজিক সঙ্কট উদ্ভূত হলে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের সুরক্ষার যে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে, তার বিন্দুমাত্র রূপায়ণ দেখেনি পশ্চিমবঙ্গ। সুতরাং, অতিমারীর প্রকোপে যখন দিশাহীন গোটা দেশ তথা রাজ্যের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষ, তখন অবজ্ঞা ছাড়া সরকারের আর কিছুই দেওয়ার ছিল না তাদের। শুধু তিন মাসে ১০০০ টাকা করে অনুদান নেওয়া ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার আর কিছুই করেনি।

কোভিড অতিমারীতে সব থেকে বেশি কষ্টে আছেন জনসংখ্যার সব থেকে নিচেরতলার বৃহদাংশের মানুষ। পরিযায়ী শ্রমিক, দিন-আনা দিন-খাওয়া আর্থিক অবস্থার পরিবারগুলোর সামনে আজ অন্ধকার নেমে এসেছে। তবু দুটো ভাত জুটছে রেশনের চালে। কিন্তু সব থেকে বিপন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা, কারণ খাদ্য নিরাপত্তা আইনের সুযোগ সঠিকভাবে তারা এখনো পাচ্ছেন না। এব্যাপারে দিল্লি হাইকোর্ট সদর্থক রায় দিয়েছে। সরকার নির্দেশনামাও ঘোষণা করেছে, কিন্তু অন্নপূর্ণা অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা একটা ফ্যামিলি কনসেপ্ট। বাকিদের জন্য পিএইচএইচ অথবা সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলতে পারবেন তা রাষ্ট্র যেমন জানেন না, আমরাও তেমনি জানি না। আবার সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত ব্যক্তির কেয়ারগিভার খাবার জোগাড় করবেন, না ওষুধের কথা ভাববেন, নাকি রেশনের লাইনে দাঁড়ানোর সময় চিন্তা করবেন বাড়ির ঐ হাই-সাপোর্ট নিড ব্যক্তিটি টয়লেট করে বিছানা নোংরা করে ফেলেছে কি না। ইন্ডিপেনডেন্ট লিভিং তাই শুধু আইনের একটি পরিভাষা যা স্পেশাল এডুকেশনের ক্লাস রুমে শেখানো হয়। একবার কল্পনা করুন তো, তীব্রভাবে সেরিব্রাল পলসি অথবা অটিজম আক্রান্ত একটি শিশুর বাবা মা উভয়েই যদি কোভিড আক্রান্ত হন, তাহলে ওই শিশুটিকে দেখভাল করবে কে সমাজরাষ্ট্র ও মূলস্রোতের জনগোষ্ঠীর কাছে এর কোনও উত্তর নেই।

বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর তার প্রভাব

গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণার সপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি ছিল এই যে, এই পদক্ষেপ দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করবে। কিন্তু, লকডাউনের পর ২৫০ দিনেরও বেশি অতিক্রান্ত হলেও দেশের স্বাস্থ্যপরিকাঠামোয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে বলে স্বীকার করবেন না কেউ, বরং বিগত কয়েক মাসে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, সমাজের প্রান্তসীমায় অবস্থান করা জনগোষ্ঠীসমূহ স্বাস্থ্যপরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছেন না। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের এক বিরাট অংশকে যেহেতু শারীরিক নৈকট্যের ওপর নির্ভর করতে হয়, তাই হাসপাতালে ভর্তি হলেও উপযুক্ত পরিষেবা পাওয়া থেকে তাঁরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন। শুধু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণই নয়, স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আরও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের। করোনার চিকিৎসাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা কিছুটা অবহেলিত হওয়ার ফলে বিপন্ন হচ্ছে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তির জীবন। শুধু তাই নয়, অনিয়মিত হয়ে পড়েছে পোলিও-সহ অন্যান্য টীকাকরণের কর্মসূচি। সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে না। পাশাপাশি কোভিড মহামারীর সময়ে পালস পোলিও টিকাকরণের কাজ ঢিলেঢালা অবস্থায় দায়সারাভাবে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বের মতো তৎপরতা প্রয়োজন।

এক নতুন সংহতির লক্ষ্যে

করোনা অতিমারীর ফলে যখন বিপর্যস্ত গরিব মানুষের জীবন, যখন তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাতে ব্যর্থ, আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকেরা, যখন কেবলমাত্র প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণেই অবজ্ঞায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কিছু মানুষ, তখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে একটি ক্ষীণ আলোক বিন্দুর অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বারংবার উচ্চারিত 'সামাজিক দূরত্ব'-এর নিদান যখন সত্যিই সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে আমাদের, তখনই সমাজের প্রান্তিকতম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা আত্মনিয়োগ করতে চাই এক নতুন সংহতি নির্মাণের কাজে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবেই এবারের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক দিবসে আমাদের আহ্বান, 'আসুন, মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই'। এবারের অনুষ্ঠানে যেমন উচ্চারিত হবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবিদাওয়া, তেমনই ঘোষিত হবে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে সুষম উন্নয়নের আহ্বান। সাথে সাথে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ হবে গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিরা। আমরাও অবদান রাখব এক নতুনতর সংহতি নির্মাণের সার্বিক প্রয়াসে। এভাবেই হয়তো রচিত হবে 'শারীরিক দূরত্ব' মেনে নিয়েও এক অটুট সামাজিক নৈকট্য নির্মাণের সোপান। শুধু তাই নয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমাজের থেকে শুধুমাত্র নিতে চায়– এই সামাজিক নির্মিতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা প্রমাণ করবো যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও পারে এই রুগ্‌ণ পৃথিবীর সত্তাকে অন্তর থেকে ছুঁতে চায়। আকাশের সাহস আর জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের এই যে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ– আপনারা সেই উদ্যোগের পাশে এসে দাঁড়ান।